ভারতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি এম, সি পি আই ও নকশালপন্থী–মাওবাদীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)–র পার্থক্য কোথায় এবং কেন

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

ভারতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি এম, সি পি আই ও নকশালপন্থী–মাওবাদীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)র পার্থক্য কোথায় এবং কেন

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ : ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ৫ জুন, ২০১৩

তৃতীয় মুদ্রণ : ৫ আগস্ট, ২০১৪

প্রকাশক : মানিক মুখার্জী

কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (সি)

৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

ফোন : ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ :

গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য : ৫ টাকা

প্রকাশকের কথা

ভারতের বিপ্লবের স্তর ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের একটি নিবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক ‘অনীক’ পত্রিকায়। পরবর্তীতে দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র ‘গণদাবী’ এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণে’ প্রকাশ করা হয়। তখনই কমরেড প্রভাস ঘোষ কিছুটা পরিমার্জনা করেছিলেন। বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ও সামান্য কিছু সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি এই নিবন্ধটি এস ইউ সি আই (সি)–র মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের সাথে অন্যান্য সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় পুস্তিকাটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল।

৪৮ লেনিন সরণি

কলকাতা ৭০০০১৩ মানিক মুখার্জী

৫ আগস্ট, ২০১৪

ভারতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি এম, সি পি আই ও নকশালপন্থী–মাওবাদীদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)–র পার্থক্য কোথায় এবং কেন

ভারতবর্ষে যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবি করে, তেমন বিভিন্ন দলের মধ্যে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ ও বিপ্লব কোন পথে হবে, তা নিয়ে গুরুতর মতপার্থক্য আছে। এর মধ্যে কোনটা যথার্থ মার্কসবাদ সম্মত সেটা বিচার করতে হবে।

যে কোনও দেশের মার্কসবাদী দল সেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে, বিশেষভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নিরূপণ করে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ একটা বিশেষ দেশে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে শোষকদের শ্রেণীচরিত্র কি, পুঁজিপতিশ্রেণী মূল শোষক নাকি সাম্রাজ্যবাদ–সামন্ততন্ত্র মূল শোষক, রাষ্ট্রযন্ত্র পুঁজিপতিশ্রেণী কন্ট্রোল করছে এবং রাষ্ট্র একটি বুর্জোয়া স্বাধীন রাষ্ট্র নাকি ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক বা আধা–ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র—এর উপরই নির্ভর

করছে সে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক ও গরিব কৃষকদের মৈত্রীতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে, না সাম্রাজ্যবাদ–সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক–কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে। অর্থাৎ বিপ্লবের স্তর বা লাইনের উপরই নির্ভর করে কোন্ শ্রেণীর বিরুদ্ধে কার সাথে মিত্রতা করে লড়াই হবে এবং সেই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী ট্যাকটিক্স বা কৌশলও নির্ধারিত হয়। এই সিদ্ধান্তের সঠিকতা নির্ভর করে সঠিকভাবে মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী সেই বিশেষ দেশে বাস্তবে বিদ্যমান শ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণ করতে পারার উপর। ভারতের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সি পি আই–সি পি এম–এর লাইন, আমাদের মতে, স্ববিরোধী। একদিকে তারা বলছে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্র হচ্ছে স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং এখানে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে বিপ্লবের রণনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সি পি আই বলছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক রেভলিউশন, আর সি পি এম বলছে পিপলস ডেমোক্রেটিক রেভলিউশন। যদিও এ দুটোর মধ্যে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই এবং দু'ক্ষেত্রেই বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা স্বীকার করা হয়। বিপ্লবের এই দুই রণনীতিই একটা ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক বা আধা–ঔপনিবেশিক আধা–সামন্ততান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটা রাষ্ট্র যদি স্বাধীন ও

সার্বভৌম হয় এবং সেখানে যদি পার্লামেন্ট থাকে, তবে মার্কসবাদী–লেনিনবাদী বিচারধারা অনুযায়ী সেটা একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হতে বাধ্য এবং সেখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের চিন্তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোনও উপনিবেশ ও সামন্ততান্ত্রিক বা আধা–উপনিবেশ আধা–সামন্ততান্ত্রিক দেশ কখনও স্বাধীন ও সার্বভৌম হতে পারে না এবং তার নিজস্ব পার্লামেন্টও থাকে না। অন্যদিকে ভারতবর্ষকে আধা–ঔপনিবেশিক, আধা–সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন নকশালবাদী গ্রুপ ও মাওবাদীরাও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচার করছে। মাওবাদীরা অবশ্য ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন দেশ বা স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে না।

তাহলে দেখা দরকার, বর্তমান ভারতের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কী? এই প্রশ্নে যাওয়ার আগে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অবস্থা কী ছিল দেখা দরকার। ভারত যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ, তখনই ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন ভারত সম্পর্কে বলেছিলেন,

> “ভারতের মতো উপনিবেশিগুলির মৌলিক ও নতুন বৈশিষ্ট্য শুধু এটাই নয় যে, এখানকার জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবী দল ও আপসকামী দল এই দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, বরং প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বুর্জোয়াদের আপসকামী অংশ ইতিমধ্যেই

সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বেশি বিপ্লবের ভয় থেকে এরা নিজের দেশের শ্রমিক ও চাষীর বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ব্লক বা জোট গড়েছে ... শহর ও গ্রামের পেটিবুর্জোয়া জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাতীয় বুর্জোয়াদের আপসকামী অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পর, বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে জোট করতে পারে এবং তা করতেই হবে।" ("The fundamental and new feature of the conditions of life of colonies like India is not only that the national bourgeoisie has split up into a revolutionary party and a compromising party, but primarily that the compromising section of this bourgeoisie has already managed, in the main to strike a deal with imperialism. Fearing revolution more than it fears imperialism, ... it is forming a bloc with imperialism against the workers and peasants of its own country. ... the communist party can and must enter into an open bloc with the revolutionary wing of the

bourgeoisie in order, after isolating the compromising national bourgeoisie, to lead the vast masses of the urban and rural petty bourgeoisie in the struggle against imperialism." Tasks of the university of the peoples of the east, collected works, volume VII).

লক্ষণীয় যে ১৯২৫ সালেই স্ট্যালিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবী ও আপসমুখী – এই দুইভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং আপসমুখী বুর্জোয়াদের কম্প্রাডর নয়, জাতীয় বুর্জোয়া হিসাবেই চিহ্নিত করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচিত দলটিকে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে এটাও বোঝা যায় যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের যে অংশ বৃহৎ বুর্জোয়া এবং মুনাফার স্বার্থকেই বড় করে দেখছে, তারাই শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপসমুখী লাইন নিয়ে চলছে, একথা তিনি তখনই বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচিত দলটি (যেটা পরবর্তীকালে সি পি আই–সি পি এম ও সি পি আই এমএল–এর নানা অংশে বিভক্ত হয়েছে) প্রথম থেকেই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, সেজন্য এই দলের নেতারা স্ট্যালিনের এই অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক

গাইড লাইনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। ফলে তাঁরা স্ট্যালিনের শিক্ষার বিপরীত ভূমিকাই পালন করেছেন। কিন্তু স্ট্যালিনের গাইডেন্সে এই কাজটি চীনের ক্ষেত্রে সফলভাবে করেছিলেন মহান নেতা কমরেড মাও–সে–তুং। সেই সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পুরোপুরি বৃহৎ বুর্জোয়াদের কুক্ষিগত হয়নি, অনেকেটা চীনের প্রথম যুগের কুও–মিন–তাং পার্টির মতো ঢিলেঢালা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ছিল। তার মধ্যে আপসমুখী–আপসহীন, বিপ্লবী–অবিপ্লবী সকলেই ছিল। সেদিন ঐ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদীদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলে তাকে ব্যবহারের সুযোগ কমিউনিস্ট পার্টির ছিল, সুযোগও এসেছিল যখন আপসমুখী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী গান্ধীবাদীদের প্রার্থীকে পরাস্ত করে সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রতিনিধি হিসাবে নেতাজী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। গান্ধীবাদীরা তখন সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। সুভাষচন্দ্র আশা করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি সেই সংকট মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু সি পি আই না দাঁড়িয়ে কার্যত গান্ধীবাদীদের সাহায্য করেছিল। দক্ষিণপন্থীদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের চাপে বাধ্য হয়ে শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। এসময় কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুমতি না নিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের ডাক দেওয়ার অভিযোগে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে সাসপেন্ড করে।

নেতাজী বলেছিলেন, সাসপেন্ড করার নামে কার্যত তাঁকে বহিষ্কার করা হল। সুভাষচন্দ্র সেদিন ভারতের সমস্ত বামপন্থী দলগুলোকে আহ্বান জানিয়েছিলেন লেফট কনসোলিডেশন (বামপন্থীদের ঐক্যমঞ্চ) গড়ে তোলার জন্য। এই লক্ষ্য নিয়ে রামগড়ে তিনি একটা ঐতিহাসিক অধিবেশন করেছিলেন। এমন কথাও বলেছিলেন যে, লেফট কনসোলিডেশন গড়ে উঠলে ও শক্তিশালী হলে, তা এ দেশে একটা সত্যিকারের মার্কসবাদী পার্টি গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করবে। এ সত্ত্বেও সি পি আই সেদিন সাড়া দেয়নি। এর দ্বারা সেদিন তারা কত বড় সম্ভাবনাকে নষ্ট করল সুভাষচন্দ্র বসু মার্কসবাদী না হলেও একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী হিসাবে মার্কসবাদ, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও মহান স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ফলে, তদানীন্তন সি পি আই নেতৃত্ব তাঁদের ভূমিকার দ্বারা একটা বিরাট সুযোগ নষ্ট করেছিলেন, স্ট্যালিনের গাইডলাইনও লংঘন করেছিলেন। এরপর ১৯৪২ সালের আগস্ট বিদ্রোহে তারা অংশ না নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন, যার জন্য পরবর্তীকালে স্ট্যালিন তাঁদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। তারপর নেতাজীকে জাপানের ‘এজেন্ট’ আখ্যা দিয়ে আই এন এ-র লড়াইজনিত স্বাধীনতা সংগ্রামের গণআবেগ থেকে নিজেদের তো বটেই, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষদের তারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এ সবের ফলে শুধু জাতীয় ও আপসকামী জাতীয়

বুর্জোয়াদের কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অপসারণের সুযোগ নষ্ট হল তাই নয়, কমিউনিজমের মহান আদর্শ সম্পর্কেই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করা হল। সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের এই ভূমিকা শুধু কি নিছক ভুল ছিল? নাকি দলের অ–মার্কসবাদী চরিত্রের জন্যই এটা ঘটেছিল? মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, দলটি প্রথম থেকেই মার্কসবাদী চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং, সেদিন একটি যথার্থ মার্কসবাদী নেতৃত্ব থাকলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের চেহারা অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু সি পি আই–এর ভূমিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বকে শক্তিশালী হতেই সাহায্য করেছিল। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর স্ট্যালিন বর্ণিত আপসকামী জাতীয় বুর্জোয়ারাই ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান ভারতের রাষ্ট্র চরিত্র সম্পর্কে সি পি এম বলে, 'ইট ইজ এ বুর্জোয়া ল্যান্ডলর্ড স্টেট হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়াজি'। এই বিগ বুর্জোয়াজি কারা? প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে স্ট্যালিন বর্ণিত সেই জাতীয় বুর্জোয়ারা, যারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে আপসমুখী ভূমিকা পালন করেছে। এ দেশে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে একসময় সি পি এমও লড়াইয়ের স্লোগান দিত। এখন অবশ্য বইপত্রে লেখা থাকলেও মুখে বিশেষ বলে না। মহান লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী জাতীয় পুঁজি বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে একচেটিয়া পুঁজির চরিত্র

অর্জন করে ফলে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই তো বিগ বুর্জোয়াজি। এরাই এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতায় গিয়েছে। অন্যদিকে সি পি এম যে ল্যান্ডলর্ড বলছে, তারা কি ফিউডাল ল্যান্ডলর্ড না ক্যাপিটালিস্ট ল্যান্ডলর্ড? সাম্রাজ্যবাদ বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে কৃষি অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারণ নিয়ে তথাকথিত কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভ্রান্তি থাকার ফলে মহান লেনিন দেখান, এ সব দেশের কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ অনুপ্রবেশে করেছে কি না, তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জমি, গ্রামীণ শ্রমশক্তি এবং ফসল জাতীয় বাজারের পণ্য হয়েছে কি না, কৃষিতে মালিক–শ্রমিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কি না এবং জমি মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কি না – এগুলো বিচার করতে হবে। অন্যান্য দেশে এবং আমাদের দেশেও কৃষিতে সামন্ততন্ত্র আছে বোঝাতে গিয়ে কিছু তথাকথিত মাকর্সবাদী কৃষিতে ভাগচাষ প্রথা এবং নানা প্রাচীন প্রথার অবশেষ থেকে যাওয়ার কথা বলেন। এ প্রশ্নে লেনিন ১৯২০ সালে কমিডনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের ভাষণে 'প্রিলিমিনারি থিসিস অন অ্যাগ্রেরিয়ান কোশ্চেনে' বলেছিলেন,

> "সকল পুঁজিবাদী দেশে, এমনকী সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতেও বৃহৎ জোতদারদের দ্বারা ক্ষুদ্রচাষীদের উপর আধা–সামন্ততান্ত্রিক শোষণের রূপে আজও মধ্যযুগীয় প্রথার

অবশেষগুলি বহাল আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্মানিতে 'ইনস্টলিউট' ফ্রান্সে 'মেতায়ার্স', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ভাগচাষী'।" ("in all capitalist countries, even the most advanced, survivals of medievalism still exist in the form of semi-feudal exploitation of the surrounding small peasants by the big landowners, as for example, the Instleute in Germany, the metayers in France, the share-croppers in the United States ...")

ফলে আমাদের দেশেও যারা পুরনো কিছু প্রথা ও রীতিনীতি দেখিয়ে কৃষিব্যবস্থাকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা লেনিনের এই শিক্ষাকেও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এদেশে কৃষিতে পুঁজিবাদ যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। আর, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহুদিন আগেই আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা এদেশের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ 'ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যা ও চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে' ভাষণে বলেছিলেন,

"মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের বেশিরভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়া, গ্রামের বেশিরভাগ লোকের ক্রমাগত সর্বহারা এবং অর্ধ-সর্বহারার স্তরে নেমে আসা, জমির পুঁজি বিনিয়োগের

উপায় হিসাবে রূপান্তরিত হওয়া, মালিক মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হওয়া এবং কৃষি উৎপাদনের জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হওয়া – এই সবগুলিই প্রমাণ করে ভারতের কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি।" অন্যদিকে 'নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন' বক্তৃতায় কমরেড শিবদাস ঘোষ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "ভারতবর্ষের পুঁজি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কিং পুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের (মার্জার) মধ্য দিয়ে লগ্নি পুঁজি ও একটি ধনকুবের গোষ্ঠীর (ফিনানসিয়াল অলিগার্কি) জন্ম দিয়েছে— বিদেশে লগ্নি পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে।"

বর্তমানে ভারতের পুঁজিবাদ আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়েছে এবং তারা শুধু অনুন্নত দেশগুলিতেই নয়, উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও পুঁজি রপ্তানি করছে, কারখানা–খনি–তৈলক্ষেত্র কিনছে। এমনকী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ভারতের সাথে মিত্রতাও গড়ে তুলছে। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, ভারতেও যখন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিপুল পরিমাণে খাটছে, তখন এ দেশকে কি স্বাধীন বলা চলে? এ প্রসঙ্গেই লেনিনের একটি বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তিনি বলেছিলেন,

> "সকল অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফিনান্স পুঁজি এত বিরাট, বলতে পারেন, এত অমোঘ একটি শক্তি যে, তা এমনকী পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকেও নিজের অধীনস্ত করতে সক্ষম এবং বাস্তবে তা করেও থাকে।" ("finance capital is such a great, such a decisive, you might say, force in all economic relations that it is capable of subjugating, and actually does subjugate, to itself even states enjoying the fullest political independence." — Imperialism, the highest stage of capitalism).

এভাবেই সাম্রাজ্যবাদের যুগে একটা রাষ্ট্রের স্বাধীন চরিত্র কীভাবে বুঝতে হবে, তা লেনিন দেখিয়ে গেছেন, যার থেকে একথাও পরিষ্কার যে, বিশ্বপুঁজিবাদের প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী যুগে একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বলতে যা বোঝাত, সাম্রাজ্যবাদের যুগে সেটা ঠিক ঐ একইরকম বোঝায় না। স্ট্যালিন 'ইকনমিক প্রবলেমস অফ সোস্যালিজম ইন দি ইড এস এস আর' পুস্তকে যখন বলেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্শাল প্ল্যানের সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিপুল ডলার পুঁজি বিনিয়োগ করে যুদ্ধ-বিধবস্ত ব্রিটেন-ফ্রান্স সহ পশ্চিম ইডরোপকে আমেরিকার অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত করেছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই মার্কিন পুঁজির উপর নির্ভরশীলতার জন্য

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন-ফ্রান্সকে আধা-উপনিবেশ স্তরে বিবেচনা করেননি। বরং স্পষ্টভাষায় তাদের সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে অভিহিত করে বলেছিলেন,

> “সর্বপ্রথম ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কথা ধরা যাক। নিঃসন্দেহে এ দুটি দেশ সাম্রাজ্যবাদী। সস্তায় কাঁচামাল ও নিশ্চিত বাজার নিঃসন্দেহে এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ‘মার্শাল প্ল্যান সাহায্য’র আড়ালে আমেরিকানরা যেভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অর্থনীতিতে ঢুকছে এবং তাদের পরিণত করতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেজুড়ে, এবং আমেরিকান পুঁজি যেভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশগুলিতে কাঁচামাল ও বাজার দখল করছে এবং তার দ্বারা ব্রিটিশ ও ফরাসি পুঁজিপতিদের উচ্চ মুনাফার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটাবার মতলব করছে, তাতে একথা কী ভাবা যায় যে, এরা চিরদিন এই পরিস্থিতি সহ্য করবে? একথা বলাই কী অধিকতর সত্য হবে না যে, পুঁজিবাদী ব্রিটেন এবং তারপর পুঁজিবাদী ফ্রান্স, আমেরিকার আলিঙ্গন ভেঙে বেরিয়ে আসতে এবং নিজেদের স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করার জন্য এবং অবশ্যই উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য আমেরিকার সাথে সংঘাতে যেতে বাধ্য হবে?” (Take, first of all, Britain and France. Undoubtedly, they are imperialist countries. Undoubtedly, cheap raw materials and

secure markets are of paramount importance to them. Can it be assumed that they will endlessly tolerate the present situation, in which, under the guise of "Marshall plan aid", Americans are penetrating into the economies of Britain and France and trying to convert them into adjuncts of the United States economy, and American capital is seizing raw materials and markets in the British and French colonies and thereby plotting disaster for high profits of the British and French capitalists? Would it not be truer to say the capitalist Britain, and, after her, capitalist France will be compelled in the end to break from the embrace of the U.S.A. and enter into conflict with it in order to secure an independent position and, of course, high profits?)

আর, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের স্কিম অনুযায়ী এক দেশের পুঁজি তো অন্য দেশে আরও ব্যাপকভাবে রপ্তানি হচ্ছে। মার্কিন দেশেও বিদেশি পুঁজি যাচ্ছে। ফলে এটা দিয়ে কোনও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন বিচার করা চলে না।

যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের কৃষিতে এখনও সামন্ততন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব আছে এবং বিদেশি পুঁজি খাটছে, তা হলেও রাষ্ট্রের স্বাধীন বুর্জোয়া চরিত্র অস্বীকার করা যায় না। এ প্রশ্নেও লেনিন অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর একদল মার্কসবাদী পণ্ডিত লেনিনের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, রাশিয়ায় এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দেওয়া চলে না, কারণ পুঁজিবাদ অনুন্নত এবং কৃষিতে সামন্ততন্ত্র রয়েছে। লেনিন তাঁদের জবাবে বিখ্যাত এপ্রিল থিসিসে বলেছিলেন,

> "রাশিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা একটি নতুন শ্রেণীর হাতে, যথা বুর্জোয়াদের হাতে ও বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত জমিদারদের হাতে চলে গেছে। এই অর্থে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ায় সম্পূর্ণ হয়েছে।" "State Power in Russia has passed into the hands of a new class, namely the bourgeoisie and landowners who had become bourgeois. To this extent the bourgeois democratic revolution in Russia is completed.")

এরই ভিত্তিতে, রাশিয়ায় তখন পুঁজিবাদ খুবই অনুন্নত ও কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব ও বিদেশি পুঁজির প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও,

লেনিন পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করে ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। লেনিন–স্ট্যালিনের শিক্ষা হচ্ছে, কোন্ শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে, তার হাত থেকে কোন্ শ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে, এটার দ্বারাই বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয়। ফলে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে সি পি এম, সি পি আই, সি পি আই এম এল ও মাওবাদীদের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ মার্কসবাদ–লেনিনবাদবিরোধী। অন্যদিকে মার্কসবাদ–লেনিনবাদকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করে ১৯৪৮ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে লাইন নির্ধারণ করেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, শান্তিপূর্ণ পন্থায় ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে বিপ্লবের চিন্তা মার্কসবাদ–লেনিনবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সংশোধনবাদী চিন্তা। ব্রিটেনের প্রথম যুগের উদীয়মান গণতন্ত্র দেখে মহান মার্কস ঐ দেশে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বললেও তিনি অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এ কথা বলেননি এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই ফ্রান্সে সশস্ত্র শ্রমিক অভ্যুত্থান এবং তার ব্যর্থতা দেখে বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীকে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা দখল করে পুরনো বুর্জোয়া রাষ্ট্র ভেঙে নতুন শ্রমিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। আর লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুগের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বলেছিলেন, প্রাক–সাম্রাজ্যবাদী যুগের তুলনায় পুঁজিবাদ এখন সমরবাদ ও আমলাতন্ত্রের

সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ("more attached to militarism and bureaucracy")। ফলে তিনি 'স্টেট অ্যান্ড রেভোলিউশন' পুস্তকে বলেছিলেন, "বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে খারিজ করে তার স্থানে সর্বহারার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অসম্ভব।" ("The suppression of the bourgeois state by the proletarian state is impossible without a violent revolution") লেনিন ১৯১৭ সালে যখন এ কথা বলেছিলেন, তখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যতটুকু গণতন্ত্রের ধবংসাবশেষ ছিল, তারপর বহুকাল ধরেই উন্নত-অনুন্নত কোনও পুঁজিবাদী দেশে সেটুকুও নেই, সব দেশে গণতন্ত্রের নামে নানা রূপে ফ্যাসিবাদ চলছে। ফলে সশস্ত্র বিপ্লব আরও অপরিহার্য হয়েছে। কোনও সময়ে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব হতে পারে কি না - এই প্রশ্নের উত্তরে স্ট্যালিন শেষজীবনে বলেছিলেন, যখন বর্তমান গুটিকয়েক সমাজতান্ত্রিক দেশকে ঘিরে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারা পরিবেষ্টনের পরিবর্তে গুটিকয়েক পুঁজিবাদী দেশকে ঘিরে বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ে উঠবে, তখন হয়ত ঐ গুটিকয়েক পুঁজিবাদী দেশের শাসকরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারে। তাঁর এ কথা এখনও প্রাসঙ্গিক। এ প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হলেও তা বুর্জোয়া সুপারস্ট্রাকচারের অঙ্গ পার্লামেন্টের মাধ্যমে হবে না। শান্তিপূর্ণভাবে বুর্জোয়া সুপারস্ট্রাকচার ও পার্লামেন্টকে খারিজ

(ডিজলভ্)করে সোস্যালিস্ট সুপারস্ট্রাকচার গড়ে তুলতে হবে। ফলে ভারতের মতো একটা শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশে, সি পি এম–সি পি আই পার্লামেন্টে মেজরিটি হয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তত্ত্ব হাজির করেছেন, তার ফলে তাঁরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জাতীয় বুর্জোয়াদের কোনও না কোনও দলের সাথে বোঝাপড়া করে সংসদীয় রাজনীতির খপ্পরে পড়তে বাধ্য এবং বাস্তবে সেটাই বারবার ঘটতে দেখাও যাচ্ছে। জাতীয় বুর্জোয়াদের 'প্রগতিশীল' আখ্যা দিয়ে 'বুর্জোয়া ল্যান্ড লর্ড স্টেট হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়াজির বিরুদ্ধে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তত্ত্ব তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, গোড়াতে সেটা তত্ত্বগত বিভ্রান্তি থেকে হলেও এখন নেতৃত্ব এটাকে সচেতনভাবেই ভোট রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছেন দলের কর্মীদের চেতনার নিম্ন মানের সুযোগ নিয়ে। 'প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্যে'র এই তত্ত্বটি দেখিয়ে নেতারা প্রয়োজনমতো কখনও জাতীয় বুর্জোয়াদের অমুক দল বা আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলের সাথে বা প্রয়োজনমতো এই ধরনের অন্য দলের সাথে ঐক্য গড়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে ফয়দা তোলার চেষ্টা চালান শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম, গণআন্দোলনের পথ ত্যাগ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সশস্ত্র বিপ্লবের অপরিহার্যতা স্বীকার করেও কমিডনিস্টরা পার্লামেন্ট নির্বাচনে যাবে কেন? তদানীন্তন জার্মানির

একদল অতি বাম নেতার সমালোচনা করে লেনিন 'লেফট ডইং কমিউনিজম— অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিসর্ডার' লেখায় বলেছিলেন,

> "জার্মানির কমিউনিস্টদের কাছে পার্লামেন্টারি রাজনীতি অবশ্যই 'রাজনৈতিকভাবে অচল' হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ... আমরা যেন কখনই একথা মনে না করি যে, আমাদের কাছে যা অচল হয়ে গিয়েছে, তা শ্রেণীর কাছেও অচল হয়ে গিয়েছে .... জনগণের কাছে অচল হয়ে গিয়েছে। .... নিজ শ্রেণীর পশ্চাদপদ অংশকে এবং অনগ্রসর, নিপীড়িত, অজ্ঞ কৃষক জনগণকে জাগানোর ও সচেতন করার উদ্দেশ্যেই সর্বহারার বিপ্লবী দলের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পার্লামেন্টারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, পার্লামেন্টের ভিতরে সংগ্রামে অংশ নেওয়া। যতদিন না আপনারা বুর্জোয়া পার্লামেন্ট এবং বাকি প্রত্যেক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করতে সক্ষম হচ্ছেন, ততদিন আপনাদের অবশ্যই ঐসব প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থেকে কাজ করতেই হবে।"
>
> "For the communists in Germany, parliamentarism is of course 'politically obsolete', but ... we must not regard what is obsolete for us as being obsolete for the class, as being obsolete for the masses... that participation in parliamentary elections and in the struggle in

parliament is obligatory for the party of the revolutionary proletariat precisely for the purpose of educating the backward strata of its own class, precisely for the purpose of awakening and enlightening the undeveloped, downtrodden, ignorant peasant masses. As long as you are unable to disperse the bourgeois parliament and every other type of reactionary institution, you must work inside them....")

এ কারণেই লেনিন বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে 'শুয়োরের খোঁয়াড়' অভিহিত করলেও বিপ্লবের আগে রাশিয়ার পার্লামেন্ট ডুমায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এমনকী বিপ্লবের পরও ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। ক্ষমতার দখলের পূর্বে জনগণকে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের মোহ সম্পর্কে সচেতন করা কত প্রয়োজন, এটা লেনিন নিজেই রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রাক্কালে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। অনেকেই হয়তো জানেন না, নভেম্বর বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়ার কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে বলশেভিক পার্টি শুধু অংশগ্রহণই করেনি, এমনকী ক্ষমতা দখলের পর ১৯১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ঐ

বুর্জোয়া কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিকে টিকিয়ে রেখেছিল। এ বিষয়ে লেনিন বলেছেন,

> “১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর–নভেম্বর মাসের রুশ বুর্জোয়া পার্লামেন্ট–কনস্টিটিউয়েট অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে আমরা অংশ নিয়েছিলাম...১৯১৭’র ঐ সেপ্টেম্বর–নভেম্বরে রাশিয়ায় পার্লামেন্টকে রাজনৈতিকভাবে অচল বলে বিবেচনা করতে পারার অধিকার আমাদের রাশিয়ার বলশেভিকদের কি পশ্চিমের অন্যান্য যেকোন দেশের চেয়ে বেশি ছিল না? তৎসত্ত্বেও সর্বহারার রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্বে ও পরে উভয় সময়েই বলশেভিকরা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল।... একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এমনকী সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের বিজয়ের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এবং এমনকী ঐ বিজয়লাভের পরেও, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে অংশ নেওয়া বিপ্লবী সর্বহারার কোনও ক্ষতি তো করেই না, বরং এই বুর্জোয়া পার্লামেন্ট কেন খারিজ হওয়ার যোগ্য, সেকথা পশ্চাদপদ জনগণের সামনে প্রমাণ করার কাজকে তা সহজ করে দেয়, বাস্তবে তাকে সাফল্যের সাথে খারিজ করে দেওয়াটাও সহজ হয়, এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টারিজম যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ‘রাজনৈতিকভাবে অচল’ হয়ে যায়, সেই প্রক্রিয়াকেও তা ত্বরান্বিত করে। এই সত্য মেনে নিতে অস্বীকার

করলে ভয়ংকর ভুল করা হবে এবং মুখে আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করলেও বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে তার থেকে পিছিয়ে যাওয়া হবে।" "We took part in the election to the Russian bourgeois parliament, the constituent assembly in Sept.-November, 1917... did not we Russian Bolsheviks, in Sept.-Nov. 1917, have more rights than any Western country to consider that parilamentarism was politically obsolete in Russia? Nevertheless, the Bolsheviks did not boycott the constituent assembly, but took part in the election both before and after the conquest of political power, by the proletariat... It has been proved that participation in a bourgeois democratic parliament, even a few weeks before the victory of the Soviet Republic, even after that victory, not only does no harm to the revolutionary proletariat, but actually makes it easier for it to prove to the backward masses why such parliaments deserve to be dispersed; it facilitates success in dispersing them and

facilitates the process whereby bourgeois parliamentarism becomes ‘politically obsolete’. To refuse to take this into account... is to commit the greatest blunder and actually to retreat from internationalism in deeds while accepting it in words”. (Left-wing Communism ...)

তা’হলে লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী মার্কসবাদীরা পার্লামেন্টে যায় পার্লামেন্ট সম্পর্কে জনগণকে মোহমুক্ত করার এবং বাইরের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে, মোহ বাড়াবার জন্য নয়। যদি ঘটনাচক্রে কোনও দেশের পার্লামেন্ট বা বিধানসভায় মার্কসবাদী বলে পরিচিত কোনও দল এককভাবে অথবা ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্তভাবে নির্বাচনে মেজরিটি পায়, তা হলে সেই মার্কসবাদী দল কী করবে? এই প্রশ্ন লেনিনের সময়ে দেখা দেয়নি। ফলে তিনি উত্তর দিয়ে যাননি। আমাদের দেশে এই প্রশ্ন দেখা দেয় ১৯৫৭ সালে কেরালায় যখন সি পি আই মেজরিটি পেয়ে সরকার গঠন করেছিল এবং ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষার’ নামে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করেছিল। সেই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ একজন সৃজনশীল

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে লেনিনের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, মেজরিটি পেলে অবশ্যই দায়িত্ব পরিত্যাগ করবে না, একটা মার্কসবাদী দলও সেক্ষেত্রে সরকার গঠন করতে পারে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে, সরকারে থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সংবিধানের সীমাবদ্ধতা ও শ্রেণীচরিত্র উদঘাটন করা, বাইরের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে তীব্রতর করা এবং তা করার জন্য প্রয়োজনে সংঘাতেও যেতে হবে। এটাই সরকার পরিচালনার মুখ্য লক্ষ্য হবে। তাতে যদি শাসকশ্রেণী সরকার ভেঙে দেয় ক্ষতি নেই, কারণ তার দ্বারা জনগণের সামনে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রই উদঘাটিত হবে। এ বিষয়ে ১৯৬৭ সালে ১৫ আগস্ট এক ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন,

> “আমি বলি, এই যে ‘মিথ্’টা (মোহটা)—গভর্নমেন্টে গেলেই সব হয়—গভর্নমেন্টের গদিতে থেকেই তাকে ভেঙে দিতে হবে। গভর্নমেন্টের গদিতে থেকে ‘কনস্টিটিউশন’ (সংবিধান) অনুযায়ী যতটুকু ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা জনস্বার্থে বুরোক্রেসিকে পুরোপুরি কন্ট্রোল করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সাহসের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। সেখানে ব্যুরোক্রেসির চাপের কাছে কোনমতেই নতি স্বীকার করা চলবে না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পুলিশকে সরকারের প্রগতিশীল নীতি অনুযায়ী চলতে বাধ্য করতে হবে। ন্যায্য গণআন্দোলনগুলোকে পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত

রাখতে হবে। এইসব নীতিগুলো অনুসরণের ক্ষেত্রে সরকারের গদিতে আমরা কতদিন আসীন থাকতে পারব, কি পারব না – এসব কোন প্রশ্নের দ্বারাই বিভ্রান্ত হলে চলবে না। মালিকশ্রেণী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের যত চাপই থাকুক না কেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি এই কাজগুলো করতে পারে তাহলেই সত্যিকারের জনস্বার্থের অনুকূলে কাজ করা হবে। অন্যথায় জনতার আস্থাকে পদদলিত করে শেষপর্যন্ত জনস্বার্থের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।”

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনায় আমাদের দলের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সি পি এম, সি পি আই ও অন্যান্য দলের গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। কারণ তারা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার পরিচালনার পথ নিয়েছিল। শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন তীব্রতর করার পরিবর্তে দেশি–বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করে নিজেদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার বাসনায় শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলন ধ্বংস করার পথ নিয়েছিল। যেটা ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএমের দীর্ঘ শাসনে আরও প্রকট হয়ে যায়। এরা দলের কর্মীদের নানা সরকারি সুযোগ–সুবিধায় নিমজ্জিত রেখে তাদের বোঝাত আন্দোলন করলে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ভেঙে দেবে। এইভাবে নীতি–আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে যেনতেন প্রকারে সরকারি গদিতে বসা এবং

তাকে আঁকড়ে থাকাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।তাই আজ সরকারি ক্ষমতা হারিয়ে সিপিএম দলের কি হাল হয়েছে? সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি হয়েও ১৯৫৯ সালে, ১৯৬৫ সালে যে দলের কর্মীদের মধ্যে খাদ্য আন্দোলনে কিছুটা মিলিটান্সি দেখা গিয়েছিল, দীর্ঘ দিন ক্ষমতা ভোগের পর আজ সেই দল মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার ও পুলিশ–প্রশাসন ছাড়া বিশেষ চলতেই পারছে না।

ফলে যথার্থ মার্কসবাদী হিসাবে আমাদের দল লেনিনীয় শিক্ষা অনুযায়ী জনগণকে মোহমুক্ত করা এবং বাইরের একস্ট্রা পার্লামেন্টারি স্ট্রাগল অর্থাৎ গণআন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্যই পার্লামেন্টারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। যে সব দেশে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট আছে সেখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে মহান মাও সে তুঙ–ও 'প্রবলেমস অফ ওয়ার অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি' রচনায় বলেছিলেন,

> "পুঁজিবাদী দেশগুলি নিজ দেশের ভিতরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চর্চা করে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই পুঁজিবাদী দেশগুলির সর্বহারার বিপ্লবী দলের কাজ হচ্ছে, শ্রমিকদের শিক্ষিত করা এবং আইনসম্মত লড়াইয়ের দীর্ঘ পর্বের মধ্য দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করা এবং এভাবে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উচ্ছেদ ঘটাবার জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলা।" "Internally capitalist countries practise

> bourgeois democracy ... because of this characteristics, it is the task of the party of the proletariat in the capitalist countries to educate the workers and build up strength through a long period of legal struggle and thus prepare for the final overthrow of capitalism.”)

চীনে পার্লামেন্ট না থাকার জন্য তারা যে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, সে কথা উল্লেখ করে তিনি ঐ রচনায় আরও বলেছিলেন,

> “আমাদের দেশে কোনও পার্লামেন্ট নেই যা আমরা ব্যবহার করতে পারি, এবং শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করার আইনি অধিকার আমাদের নেই।” “... we have no parliament to make use of and no legal right to organise the workers to strike.”)

অতীতের নকশালপন্থী ও বর্তমানে ‘মাওবাদী’রা, যাঁরা পার্লামেন্ট বয়কটের কথা বলছেন, তাঁরা লেনিন ও মাও সে তুংয়ের শিক্ষার বিরোধী কথাই বলছেন। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, গ্রামাঞ্চলে মুক্তাঞ্চল গঠনের জন্য বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র আক্রমণ চালানোর নীতিও মাও সে তুঙের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। এদেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব যে ভ্রান্ত সেটা আগেই দেখানো

হয়েছে। ঠিক একই কারণে এখানে গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন কিছু মুক্তাঞ্চল গঠনও সম্ভব নয়। চীনে কেন এটা সম্ভব হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে মাও সে–তুঙ 'হোয়াই ইজ ইট দ্যাট রেড পলিটিক্যাল পাওয়ার ক্যান একজিস্ট ইন চায়না' লেখায় বলেছিলেন,

> "কোনও দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতশাসন দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় এক বা একাধিক ছোট এলাকায় বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তির ঘাঁটি দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকার ঘটনা বিশ্বে ইতিপূর্বে কোথাও ঘটেনি।... দু'টি কারণে এটা সম্ভব হয়েছে, যথা একটি আঞ্চলিক কৃষি অর্থনীতি (দেশজোড়া কেন্দ্রীভূত পুঁজিবাদী অর্থনীতি নয়) এবং এলাকা ভাগ করে শোষণ চালানোর জন্য নিজ প্রভাবাধীন এলাকা তৈরির সাম্রাজ্যবাদী নীতি। প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতশাসকদের মধ্যে ক্রমাগত ভাঙন ও যুদ্ধবিগ্রহ একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতশাসকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক বা একাধিক ছোট মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।' ("The long term survival inside a country of one or more small areas under Red political power completely encircled by a white regime is a phenomenon that has never occurred anywhere else in the world. ... Two things

account for its occurrence, namely, a localised agricultural economy (not a unified capitalist economy) and the imperialist policy of marking off spheres of influence in order to divide and exploit. The prolonged splits and wars within the white regime provide a condition for the emergence and persistence of one or more small Red areas under the leadership of the Communist Party amidst the encirclement of the white regime.")

ভারতের মতো একটি কেন্দ্রীভূত বাজার অর্থনীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে কি চীনের ওই পরিস্থিতির কোনও মিল আছে? ভারতে কি চীনের মতো আলাদা আলাদা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের অধীন 'প্রভাবাধীন এলাকা', ('স্ফিয়ারস অফ ইনফ্লুয়েন্স') ও 'ওয়ারলর্ডরা' আছে? মার্কস–এঙ্গেলস–লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ সকলেই বারবার বলেছেন, একটা দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় শিক্ষিত, অনুপ্রাণিত ও সংঘবদ্ধ করে রাশিয়ার সোভিয়েতের মতো বা চীনের বিপ্লবী কমিটির মতো হাতিয়ারের মধ্য দিয়ে জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে এবং তারপরই শ্রমিকশ্রেণীর দলের নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হবে।

জনগণকে অসচেতন ও অসংগঠিত রেখে শুধুমাত্র বিপ্লবী দল বা তার কিছু নেতা ও কর্মী অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বিপ্লব হবে না। ১৯৬৬ সালের ৮ আগস্ট চীনের কমিডনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কিত প্রস্তাবে মাও সে তুঙ বলেছিলেন,

> "একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বপ্রথম মতাদর্শগত ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য জনমত তৈরি করা দরকার। একথা যেমন বিপ্লবী শ্রেণীর ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীর ক্ষেত্রেও সত্য।"("To overthrow a political power it is always necessary first of all to create public opinion to do work in the ideological sphere. This is true for the revolutionary class as well as for the counter-revolutionary class.")

তাঁর নেতৃত্বে চীনের পার্টি এই কষ্টসাধ্য কাজটি করেছিল বলেই বিপ্লব জয়যুক্ত করতে পেরেছিল। অতীতের নকশালপন্থীরা ও বর্তমান মাওবাদীরা মহান মাও সে তুঙের এই শিক্ষার কোনও গুরুত্বই বোঝেননি। এর ফলে উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, বাস্তবে বিপ্লবের নামে এখানে সেখানে কিছু ব্যক্তিহত্যাই চলছে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্র এটাকে

ব্যাপক প্রচার দিয়ে মার্কসবাদ–লেনিনববাদ ও মাও সে–তুঙের চিন্তাধারার ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার কাজে লাগাচ্ছে এবং একেই অজুহাত করে নানা কালা কানুন এনে ও রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি বাড়িয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধবংস করতে পারছে। বর্তমান মাওবাদীরা কি বুঝছেন যে, গরিব আদিবাসী ও অন্যান্য শোষিত জনগণের যে ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন বিরাট সম্ভাবনা ও সর্বভারতীয় তাৎপর্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লালগড়ে গড়ে ডঠেছিল তাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ধবংস করতে কার্যত রাষ্ট্রকে সহায়তাই করছে মাওবাদীদের এই ধরনের মাও সে–তুঙের শিক্ষাবিরোধী কার্যকলাপ। এটা মাওবাদীরা জেনে করুন বা না–জেনে করুন, ফলাফল একই হচ্ছে। তাঁরা কি ভেবে দেখেছেন, যে বুর্জোয়ারা রাশিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের মহান বিপ্লবী সংগ্রামের বিশেষ কোনও প্রচারই হতে দেয়নি, যাতে দুনিয়ার জনগণ অনুপ্রাণিত হতে না পারে, সেই বুর্জোয়াদের প্রচারমাধ্যম কেন প্রতিদিন তাঁদের এত ফলাও প্রচার দিচ্ছে? ফলে মার্কসবাদের নামে সি পি এম ও সি পি আই সংশোধনবাদ ও সংস্কারবাদের চর্চা করছে, অন্য দিকে মাওবাদী ও নকশালপন্থীরা উগ্র বামপন্থার চর্চা করছে।

এ দেশের পূর্বতন অবিভক্ত সি পি আই ও তার থেকে বেরিয়ে আসা সিপিএম ও নকশালপন্থী নেতা–কর্মীদের মধ্যে অনেকেরই প্রথমদিকে কমিউনিজমের প্রতি আবেগ, সততা, নিষ্ঠা ও নিজেদের জীবনে ত্যাগ

থাকা সত্ত্বেও মার্কসবাদের দর্শনগত সঠিক উপলব্ধি না থাকায়, দলগঠনে যথার্থ লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করায়, এ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত (কংক্রিটাইজেশন) করতে ব্যর্থ হয়ে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ করতে সক্ষম না হওয়ায়, যথার্থ সর্বহারা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ ও যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে না পারায়, সঠিক বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল এবং সর্বোপরি সর্বহারা বিপ্লবী সংস্কৃতি নির্ধারণে ব্যর্থ হওয়ায় এরা যথার্থ শ্রমিক শ্রেণির দলের পরিবর্তে পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলে পর্যবসিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান অংশটি সংশোধনবাদ–সংস্কারবাদে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তারই পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে সৎ, আবেগসর্বস্ব অপরাংশ লেনিনের ভাষায় বিপ্লবের নামে ‘শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার’ চর্চা করছে। ভারতের বিপ্লবী সংগ্রাম, শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও বাম এই দুই সোস্যাল ডেমোক্রেটিক রাজনীতি প্রধান বাধা হিসাবে কাজ করছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির এই দুইটি ধারার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েই এ দেশের শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনকে এগোতে হবে। স্ট্যালিন বলেছিলেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে পরাস্ত না করে পুঁজিবাদী শাসনের অবসান ঘটানো যায় না।(“It is impossible to put an end to capitalism, without putting an end to social democratism”)।